ঐতিহাসিক অধ্যায় — 01

দুই ঐতিহ্যের মিলনে নবদ্বীপের রাস

কার্তিক পূর্ণিমার একটি তিথি কীভাবে বৈষ্ণব ভক্তি, শক্তিপূজা, শিল্প ও নগর-শোভাযাত্রার সম্মিলিত উৎসবে পরিণত হল

নবদ্বীপের রাসের বিশেষত্ব তার নাম ও বর্তমান প্রকাশভঙ্গির মধ্যে নিহিত। ‘রাস’ শব্দটি মূলত শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার বৈষ্ণব ঐতিহ্য থেকে এসেছে। অথচ আজ এই উৎসবের সবচেয়ে দৃশ্যমান অংশ জুড়ে থাকে কালী, ভদ্রকালী, মহিষমর্দিনী ও অন্যান্য দেবদেবীর বিরাট প্রতিমা। একই কার্তিক পূর্ণিমায় রাধাকৃষ্ণের পূজা এবং শক্তির নানা রূপের আরাধনা চলতে থাকে। তাই একে একটি অপরিবর্তিত প্রাচীন অনুষ্ঠান না ভেবে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ধারার ক্রমশ মিলিত হওয়ার ফল হিসেবে বোঝা যথাযথ।

এই পরিবর্তনের পটভূমি নবদ্বীপের নিজস্ব ইতিহাস। সংস্কৃত শিক্ষা, ন্যায়শাস্ত্র, শ্রীচৈতন্য ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের পাশাপাশি এখানে শাক্তাচার ও তন্ত্রসাধনারও দীর্ঘ পরম্পরা ছিল। আঠারো শতকে নদিয়ার রাজপরিবারের পৃষ্ঠপোষকতা শক্তিপূজাকে বিশেষ সামাজিক মর্যাদা দেয় বলে স্থানীয় ঐতিহাসিক বিবরণে উল্লেখ আছে। পরবর্তী সময়ে পটচিত্র এবং ছোট আকারের মৃন্ময় প্রতিমার সঙ্গে যুক্ত হয় সুবৃহৎ প্রতিমা, চালচিত্র, শিল্পী-প্রতিযোগিতা ও জনসমাগম।

এই উৎসবের জন্মের একটি সর্বসম্মত সাল নেই। কোনও বিবরণে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়কে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়; অন্য বিবরণে প্রাচীন গৃহপূজা, পরবর্তী রাজ-পৃষ্ঠপোষকতা ও আরও পরে গড়ে ওঠা গণ-উৎসবকে আলাদা ধাপ বলা হয়েছে। এই বক্তব্যগুলি পরস্পরবিরোধী হওয়া বাধ্যতামূলক নয়—পূজার প্রচলন, প্রকাশ্য উদ্‌যাপন এবং আড়ং শোভাযাত্রা একই বছরে শুরু হওয়ার কথা নয়।

নবদ্বীপের রাসের ইতিহাসের আসল প্রশ্ন তাই এই: শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্মৃতির সঙ্গে যুক্ত একটি পুণ্যরাত্রি কীভাবে দেবীমূর্তি, লোকশিল্প, পাড়ার পরিচয় এবং সমবেত নাগরিক উৎসবের প্রধান মঞ্চ হয়ে উঠল? এই প্রতিবেদনের পরবর্তী অধ্যায়গুলি সেই ধারাবাহিক রূপান্তরকে অনুসরণ করে।

> **সারকথা** — মূল তিনটি ঐতিহাসিক স্তর: বৈষ্ণব রাস ও পটপূর্ণিমা; শাক্ত প্রতিমার পৃষ্ঠপোষকতা; উনিশ-বিশ শতকে গণ-আড়ং।

তথ্যসূত্রের নির্দেশ: [১, ২, ৩]

ঐতিহাসিক অধ্যায় — 02

মহা রাসের পূর্বে নবদ্বীপ

একটি প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্রের বহুধর্মী সমাজ ও তার উৎসব-সংস্কৃতি

আধুনিক রাসের বিরাট শোভাযাত্রার বহু আগে নবদ্বীপ ছিল জ্ঞানচর্চার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। সংস্কৃত ব্যাকরণ, ন্যায়, স্মৃতিশাস্ত্র ও দর্শনের টোল এবং পণ্ডিতসমাজ বহুদূর পর্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। এই পরিবেশটি রাসের প্রাথমিক ইতিহাস বুঝতে জরুরি, কারণ সেই সময় উৎসবের অনেক আচার পরিচালিত হত গৃহস্থ পরিবার, আচার্য, পুরোহিত এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে; আজকের মতো বড় পাড়া-ভিত্তিক কমিটি তখন সর্বত্র প্রধান সংগঠক ছিল না।

শ্রীচৈতন্য (১৪৮৬–১৫৩৩) নবদ্বীপকে বাংলা বৈষ্ণবধর্মের ইতিহাসে অনন্য স্থান দিয়েছেন। নামসংকীর্তন, রাধাকৃষ্ণপ্রেম, সমবেত ভজন ও ভক্তির আবেগকে কেন্দ্র করে একটি শক্তিশালী ধর্মীয় সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। নবদ্বীপ তীর্থক্ষেত্রের মর্যাদা পায়। কিন্তু বৈষ্ণবধর্মের বিকাশের ফলে শৈব, শাক্ত, তান্ত্রিক কিংবা পুরনো ব্রাহ্মণ্য পরিবারের আচারগুলি লোপ পায়নি; বিভিন্ন ধারার মানুষ একই অঞ্চলে ধর্মীয় জীবনযাপন করতেন।

কিছু জনপ্রিয় বর্ণনায় প্রাচীন নবদ্বীপকে বৈষ্ণব ও শাক্তদের অবিরাম সংঘর্ষের ক্ষেত্র বলে দেখানো হয়। মতপার্থক্য ও মর্যাদার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, কিন্তু দৈনন্দিন ধর্মাচার সবসময় কঠোর বিভাজন মানত না। কোনও পরিবার বৈষ্ণব পর্ব পালন করেও দেবীর পূজায় অংশ নিতে পারত। পরবর্তীকালের রাসের মিলিত রূপ বুঝতে হলে এই বহুমাত্রিক সামাজিক বাস্তবতাকে গুরুত্ব দিতে হয়।

নদীর গতিপথ, বসতির বিস্তার ও মহল্লার স্থানান্তরের কারণে পুরোনো নবদ্বীপের ভূগোলও আজকের মতো ছিল না। ফলে কোনও বর্তমান রাস্তা, প্রতিমা বা মন্দিরকে যথেষ্ট দলিল ছাড়া বহু শতক আগের একই স্থানের ধারাবাহিকতা বলে ধরে নেওয়া উচিত নয়। লিখিত সূত্র, পাড়ার স্মৃতি, পূজার নিয়ম ও ভৌগোলিক পরিবর্তন—সব মিলিয়ে অতীতকে বিচার করতে হয়।

> **সারকথা** — রাসের ইতিহাস একটি বহুধর্মী নগর-সমাজ থেকে শুরু হয়; কোনও একদিনে সম্পূর্ণ নতুন উৎসবের আবির্ভাব থেকে নয়।

তথ্যসূত্রের নির্দেশ: [১, ২, ৫]

ঐতিহাসিক অধ্যায় — 03

‘রাস’ শব্দের বৈষ্ণব অর্থ

শাক্ত রাসের প্রকাশ্য রূপ গড়ে ওঠার আগেই কার্তিক পূর্ণিমা কেন গুরুত্বপূর্ণ ছিল

বৈষ্ণব তত্ত্বে রাস কেবল নৃত্য বা আমোদ নয়; এটি ভক্তি ও ঈশ্বরপ্রেমের এক বিশেষ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গোপীদের রাসলীলাকে দেবতা ও ভক্তের গভীর সম্পর্কের প্রতীক হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। রাধা এই প্রেমতত্ত্বের কেন্দ্রীয় চরিত্র। শরতের পূর্ণিমা, কীর্তন, পদাবলি, শাস্ত্রপাঠ এবং লীলাচিত্রের মাধ্যমে সেই আখ্যানকে ভক্তসমাজে স্মরণ করার রীতি গড়ে ওঠে।

নবদ্বীপের প্রাচীন বৈষ্ণব রাসের প্রকাশ ছিল মন্দির, আখড়া ও বৈষ্ণব-আবাসে। রাধাকৃষ্ণ এবং গোপীদের প্রতিমা বা চিত্র, খোল-করতাল, কীর্তন ও পদগানের মধ্যে উৎসব অনুষ্ঠিত হত। এই পরিবেশকে বর্তমান আড়ংয়ের উচ্চস্বরের বাদ্য এবং আকাশছোঁয়া প্রতিমার সঙ্গে এক করে দেখা যাবে না। দুই রূপের মধ্যে ধর্মীয় তিথির যোগ আছে, কিন্তু প্রকাশভঙ্গি ও সামাজিক পরিসর বহু বদলেছে।

ঐতিহাসিক আলোচনায় বৈষ্ণব রাসের গভীর পটভূমিকে শ্রীচৈতন্য-পরবর্তী ভক্তিসংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত করা হয়। তবে তার অর্থ এই নয় যে বর্তমানের শাক্ত-প্রধান সুবিশাল রাস চৈতন্যের জীবদ্দশাতেই একই রূপে ছিল। তিথির প্রাচীন গুরুত্ব এবং পরবর্তীকালের জনউৎসবের কাঠামোকে ইতিহাসে পৃথক স্তর হিসেবে দেখা উচিত।

‘রাস’ নামটি টিকে থাকার ব্যাখ্যাও এখানে আছে। উৎসবের দিন ও স্মৃতির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার সম্পর্ক অটুট থাকে, কিন্তু সর্বজনীন প্রদর্শনের প্রধান আকর্ষণ ক্রমশ নানা দেবীমূর্তি হয়ে ওঠে। নামটি একটি পুরনো বৈষ্ণব উৎসকে ধরে রাখে; আর বর্তমান প্রতিমা-সংস্কৃতি জানায় শক্তি-উপাসনার বিস্তারের কথা।

> **সারকথা** — তিথি ও ধর্মীয় স্মৃতিতে ধারাবাহিকতা রয়েছে; প্রকাশ্যে কোন দেবমূর্তি প্রাধান্য পাবে, সেখানে পরিবর্তন এসেছে।

তথ্যসূত্রের নির্দেশ: [১, ২, ৩]

ঐতিহাসিক অধ্যায় — 04

পটপূর্ণিমা ও চক্ররাসের ধারা

চিত্রপট থেকে ঘূর্ণায়মান রাসমঞ্চ—প্রাচীন দৃশ্যশিল্পের নিদর্শন

নবদ্বীপের রাসের পুরনো একটি নাম ‘পটপূর্ণিমা’। এখানে ‘পট’ বলতে আঁকা দেবচিত্র এবং ধর্মীয় কাহিনির দৃশ্যরূপকে বোঝানো হয়। বিভিন্ন বিবরণে রাধাকৃষ্ণের রাসলীলার পট মন্দির ও আখড়ায় প্রদর্শনের কথা আছে। যেখানে স্থায়ী প্রতিমা বা বিশাল মণ্ডপ ছিল না, সেখানে একটি চিত্রপটও পুণ্যকাহিনিকে সকলের সামনে তুলে ধরতে পারত।

আরও একটি বৈষ্ণব দৃশ্যরূপের কথা জানা যায়—চক্রাকারে সাজানো রাস। মাঝখানে রাধাকৃষ্ণ, চারদিকে গোপীগণ; চাকা বা মঞ্চ ঘুরলে রাসনৃত্যের বৃত্তাকার ভাবটি প্রকাশ পেত। একে ‘চক্ররাস’ বলা হয়। ২০২২ সালের একটি গবেষণাপত্রে ১৯১০ সালে হরিসভা মন্দিরে শীতিকণ্ঠ ভট্টাচার্যের সঙ্গে যুক্ত একটি ঘূর্ণায়মান চক্ররাসের উল্লেখ রয়েছে। এই সালটি নির্দিষ্ট একটি প্রতিষ্ঠিত আয়োজনের; নবদ্বীপের সমস্ত চক্রাকার রাসচিত্রের প্রথম উদ্ভবের সাল হিসেবে ব্যবহার করা ঠিক নয়।

পটচিত্রের গুরুত্ব শুধু সাজসজ্জায় সীমিত ছিল না। চিত্রশিল্পী দেবদেবীর সম্পর্ক, পুরাণের কাহিনি এবং ধর্মীয় ভাবনাকে রং ও রেখায় দৃশ্যমান করতেন। সময়ের সঙ্গে মাটির প্রতিমার প্রচলন বাড়লেও এই চিত্রধারা হারিয়ে যায়নি। বৃহৎ প্রতিমার পিছনে আঁকা চালচিত্র বা দেবীপট সেই প্রাচীন দৃশ্য-কথনেরই পরিণত রূপ।

তাই নবদ্বীপের রাসকে ‘পট থেকে প্রতিমা’—এমন সরল বিচ্ছেদ হিসেবে দেখা যায় না। বরং পট, মাটির মূর্তি, অলংকরণ ও পৌরাণিক দৃশ্য একত্রে এক যৌগিক শিল্পরীতি তৈরি করেছে। দর্শক প্রতিমাকে পূজা করেন, আবার বৃহৎ চিত্রপট থেকে তার কাহিনি ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটও উপলব্ধি করেন।

> **সারকথা** — ‘পটপূর্ণিমা’ পুরনো দৃশ্যশিল্পের স্মারক; চক্ররাস নবদ্বীপে বৈষ্ণব উপস্থিতির ধারাবাহিকতার পরিচয়।

তথ্যসূত্রের নির্দেশ: [১, ৩]

ঐতিহাসিক অধ্যায় — 05

শক্তিসাধনা ও তান্ত্রিক ঐতিহ্য

দেবী-আরাধনার যে প্রাচীন ভিত্তির উপর শাক্ত রাসের বিস্তার ঘটেছিল

শাক্ত রাসের বিকাশকে শুধুমাত্র কোনও এক রাজার আদেশ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। নবদ্বীপ ও বৃহত্তর নদিয়া অঞ্চলে দেবীপূজা, তন্ত্রচর্চা এবং শক্তিসাধনার নিজস্ব পরম্পরা ছিল। স্থানীয় ইতিহাসে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের নাম বাংলায় কালী-উপাসনার রীতির সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত। এই ধর্মীয় পরিবেশে শক্তিকে নানা দেবীরূপে উপলব্ধি করার একটি সমৃদ্ধ আচারভিত্তি আগেই তৈরি হয়েছিল।

গৃহস্থের নিয়মিত পূজা থেকে নির্দিষ্ট পাড়া, পরিবার বা সাধক-পরম্পরার আচার—শক্তিপূজার রূপ ছিল বহুবিধ। কালী, শ্যামা, ভদ্রকালী, অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী ও মহিষমর্দিনী বিভিন্ন দৃষ্টিতে মাতৃশক্তিকে প্রকাশ করেন। দেবীমূর্তির এই বৈচিত্র্যই পরে নবদ্বীপের রাসকে স্বতন্ত্র চরিত্র দেয়। একই উৎসবে অংশ নিলেও প্রত্যেক পাড়া বা গোষ্ঠীকে একই প্রতিমা বা একই কাহিনি অনুসরণ করতে হয়নি।

তান্ত্রিক অতীত নিয়ে প্রচলিত কিছু কাহিনিতে বৈষ্ণবদের সঙ্গে বিরোধ অথবা কঠোর সাধন-পদ্ধতির চাঞ্চল্যকর বর্ণনা আছে। এগুলি স্থানীয় স্মৃতির অংশ হলেও সব ঘটনা সমানভাবে দলিলসমর্থিত নয়। তাই এমন কাহিনি যাচাই ছাড়া চূড়ান্ত ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে তুলে ধরা উচিত নয়। অপেক্ষাকৃত নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্ত হল—শাক্ত উপাসনা বড় আকারের সর্বজনীন রাসের আগেই এই অঞ্চলে বিদ্যমান ছিল।

কার্তিক পূর্ণিমায় লোকসমাগম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই শক্তিপূজার উপাচার, পুরোহিত, প্রতিমা, মানত, লোককথা ও পৃষ্ঠপোষকতার ধারা আরও দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। নতুন কোনও দেবীতত্ত্ব উদ্ভাবনের প্রয়োজন হয়নি; বরং পূর্বপরিচিত আচারগুলি একটি বড় বার্ষিক উৎসবের সামাজিক পরিসর পায়।

> **সারকথা** — শাক্ত সাধনা দিয়েছিল ধর্মীয় ভিত্তি; রাজ-পৃষ্ঠপোষকতা ও জনঅংশগ্রহণ পরে তার ব্যাপ্তি বাড়ায়।

তথ্যসূত্রের নির্দেশ: [১, ২, ৫]

ঐতিহাসিক অধ্যায় — 06

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়

আঠারো শতকে নদিয়ার রাজপরিবার কীভাবে উৎসবের চরিত্র বদলাতে সাহায্য করেছিল

নদিয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের শাসনকাল সাধারণত ১৭২৮ থেকে ১৭৮২ হিসেবে ধরা হয়। নবদ্বীপের রাসের ইতিহাসে তাঁর নাম বিশেষভাবে উচ্চারিত। স্থানীয় ইতিহাস-অনুসন্ধানী শান্তিরঞ্জন দেবকে উদ্ধৃত করে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আনুমানিক ১৭৫০ সালের পর রাজা ধর্মীয় অনুষ্ঠান, মন্দির এবং পূজার পৃষ্ঠপোষকতায় বেশি মন দিতে পেরেছিলেন। একই সময়পর্বের সঙ্গে জগদ্ধাত্রীপূজা ও বারোদোলের মতো আয়োজনকেও যুক্ত করা হয়েছে।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের শাক্ত অনুরাগ এবং রাজদরবারের সামাজিক প্রভাব ছিল গুরুত্বপূর্ণ। রাজপরিবারের স্বীকৃতি পেলে কোনও আঞ্চলিক আচার সমাজে অধিক মর্যাদা পেত; পুরোহিত, পণ্ডিত, শিল্পী ও ধনী পৃষ্ঠপোষকদের অংশগ্রহণ বাড়তে পারত। ব্যক্তিগত বা সীমিত পরিসরের পূজা বৃহত্তর জনসমাজে প্রচারিত হওয়ার জন্য এই প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন কার্যকর ছিল।

কিছু ঐতিহাসিক ব্যাখ্যায় বলা হয়, বৈষ্ণব প্রতিষ্ঠানের প্রভাব কমানোর উদ্দেশ্যে কৃষ্ণচন্দ্র রাসপূর্ণিমায় শক্তিপূজাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন। তবে সংবাদপত্রে প্রকাশিত ইতিহাসবিদের বক্তব্যে বিরোধের বিষয় হিসেবে বিশেষত শ্রীচৈতন্যকে অবতাররূপে পূজা করা এবং ধর্মীয় কর্তৃত্বের প্রশ্ন উঠে এসেছে। এ থেকে কৃষ্ণচন্দ্র সব বৈষ্ণব উপাসনার বিরোধী ছিলেন—এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না। অন্য ধারার বিবরণে নদিয়ার রাজপরিবারের কৃষ্ণ ও কালী উভয়ের প্রতিই শ্রদ্ধার কথা আছে।

সুতরাং কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকে শাক্ত উৎসবের দৃশ্যমান প্রসারের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় বলা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু ১৭৫০-এর দশককে কোনও প্রমাণ ছাড়া সমগ্র রাসের একমাত্র ‘জন্মসাল’ বলা ভুল হবে। তার আগের পূজা, সমসাময়িক আচার এবং পরের গণউৎসব—সবকিছুর ইতিহাস আলাদা করে বিচার করা প্রয়োজন।

> **সারকথা** — শাক্ত রাসের বিস্তারে ১৭৫০-এর দশককে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাব্য পর্ব বলা যায়; সর্বসম্মত প্রথম সূচনা নয়।

তথ্যসূত্রের নির্দেশ: [১, ২, ৩]

ঐতিহাসিক অধ্যায় — 07

বৈষ্ণব রাস থেকে শাক্ত রাস

ধীরে ধীরে কীভাবে এক পূর্ণিমায় নানা দেবীমূর্তি এবং পাড়াভিত্তিক আয়োজন যুক্ত হল

নবদ্বীপের বৈষ্ণব রাস রাতারাতি শাক্ত রূপ পায়নি। একটি ব্যাখ্যায় রাজ-পৃষ্ঠপোষকতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়: কার্তিক পূর্ণিমায় রাধাকৃষ্ণের লীলা উপলক্ষে যখন মানুষ জড়ো হতেন, তখন সেই পরিচিত তিথিতেই দেবীমূর্তি ও শক্তিপূজাকে জনসমক্ষে আনার সুযোগ তৈরি হয়। নতুন একটি বার্ষিক দিন সৃষ্টি না করেও শাক্ত অনুষ্ঠান প্রচারের উপযুক্ত পরিবেশ পাওয়া সম্ভব ছিল।

অন্য ব্যাখ্যায় নদিয়ার পণ্ডিত ও পুরোহিত পরিবারগুলির ভূমিকা প্রধান। অনেক ব্রাহ্মণ বিভিন্ন স্থানে দুর্গা বা লক্ষ্মীপূজার পৌরোহিত্য করতে যেতেন; পরে কার্তিক পূর্ণিমায় নিজের বাড়িতে আরাধনার সুযোগ পেতেন—এমন একটি বর্ণনা গবেষণায় পাওয়া যায়। ঘরোয়া পূজা দেখতে আত্মীয়, প্রতিবেশী ও অন্য পাড়ার মানুষ এলে ধীরে ধীরে তা বৃহত্তর অনুষ্ঠানে রূপ নেয়। রাজদরবার এবং গৃহস্থসমাজ—দুই ধারাই একসঙ্গে কাজ করে থাকতে পারে।

পূজার সংখ্যা বাড়লে শহরের উৎসব-অভিজ্ঞতাও বদলে যায়। একজন ভক্ত আর কেবল একটি মন্দিরে থাকেন না; নানা পাড়ায় গিয়ে প্রতিমা দেখেন, গীতবাদ্য শোনেন, চিত্রকলা ও মৃৎশিল্পের সৌন্দর্য উপলব্ধি করেন। এই পাড়া থেকে পাড়ায় চলাচলের অভ্যাসই পরে বড় আড়ং শোভাযাত্রার সামাজিক ভিত্তি প্রস্তুত করে।

ঘটনাপ্রবাহে ধর্ম, ক্ষমতা ও শিল্প পরস্পরকে শক্তিশালী করেছে। রাজকীয় মর্যাদা পূজাকে উৎসাহ দেয়; স্থানীয় বিশ্বাস আচারকে বাঁচিয়ে রাখে; কারিগররা প্রতিমাকে অনন্য করেন; দর্শনার্থীরা নতুন জনপরিসর গড়ে তোলেন। এভাবেই কৃষ্ণের রাসলীলার স্মৃতিতে আবদ্ধ তিথি অনেক দেবীর আরাধনার এক স্বতন্ত্র নগর-উৎসব হয়ে ওঠে।

> **সারকথা** — রূপান্তর বুঝতে রাজ-পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি পরিবার ও পাড়ায় পাড়ায় পূজার বিস্তারকেও গুরুত্ব দিতে হয়।

তথ্যসূত্রের নির্দেশ: [১, ২, ৩]

ঐতিহাসিক অধ্যায় — 08

এলেনিয়া কালী ও প্রাচীন প্রতিমা

স্থানীয় স্মৃতিতে সংরক্ষিত প্রথম দিককার পূজা ও তাদের তারিখ নিয়ে মতভেদ

এলেনিয়া বা এলানিয়া কালীকে নবদ্বীপের শাক্ত রাসের প্রাচীনতম ধারাগুলির অন্যতম বলে উল্লেখ করা হয়। কিছু স্থানীয় বিবরণে তান্ত্রিক ভৃগুরামের সঙ্গে এই পূজার সম্পর্ক এবং ১৭২৮ সালের কথা বলা হয়েছে। অন্য প্রকাশিত প্রতিবেদনে রাসের প্রাথমিক মৃন্ময় প্রতিমার প্রচলনকে ১৭৫২ থেকে ১৭৫৬ সালের কোনও এক সময়ের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। প্রথমটি পুরনো কালী-উপাসনার সূচনা এবং দ্বিতীয়টি রাস-পর্বে প্রতিমার প্রকাশ্য স্থান পাওয়ার স্মৃতি হতে পারে; কিন্তু বর্তমান সূত্রে এই সমন্বয় চূড়ান্ত প্রমাণিত নয়।

এই কালীমূর্তির বর্ণনায় মুক্তকেশী, কৃষ্ণবর্ণা দক্ষিণাকালীর ছবি পাওয়া যায়। স্থানীয় নামের ব্যুৎপত্তিকেও এলোমেলো বা খোলা চুলের সঙ্গে যুক্ত করার মৌখিক ব্যাখ্যা আছে। ‘শবশিবা’ নামে আর-একটি পুরনো প্রতিমার উল্লেখ এবং শীতিকণ্ঠ বাচস্পতির সঙ্গে তার সম্পর্কও কোনও কোনও বিবরণে পাওয়া যায়। এগুলি প্রাচীন পূজার স্মৃতি বোঝার সূত্র, তবে নির্দিষ্ট বছর ও ক্রমকে সর্বজনস্বীকৃত দলিল হিসেবে গণ্য করা যায় না।

এই প্রাথমিক প্রতিমাগুলির মাধ্যমে একটি স্থায়ী সামাজিক রীতি গড়ে ওঠে—প্রতিটি দেবী কোনও পাড়া, পরিবার বা নির্দিষ্ট আচারপরম্পরার পরিচয় বহন করেন। প্রতিমা বড় হলেও পূজার পুরনো নাম, ভোগ, পুরোহিতের সম্পর্ক কিংবা বিশেষ মূর্তিভঙ্গি বহু বছর ধরে টিকে থাকতে পারে। ফলে একটির ইতিহাস অন্যটির সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে যায় না।

রাসের পুরোনো দেবীমূর্তি তাই শুধু শিল্পের পরিবর্তনের ইতিহাস নয়। এগুলির ভিতরে রয়েছে মানত, বংশানুক্রমিক দায়িত্ব, স্মৃতি ও স্থানীয় পবিত্রতার ধারণা। নতুন কোনও বিশাল প্রতিমা দর্শকদের আকর্ষণ করলেও বহু প্রাচীন পূজার প্রতি মানুষের টান এই গভীর ঐতিহাসিক সম্পর্ক থেকেই জন্মায়।

> **সারকথা** — ১৭২৮ এবং ১৭৫২–১৭৫৬ একই ঘটনার নিশ্চিত দুটি সাল নয়; প্রাচীন উপাসনা ও পরবর্তী রাস-প্রতিমার পৃথক স্তর হতে পারে।

তথ্যসূত্রের নির্দেশ: [১, ৬]

ঐতিহাসিক অধ্যায় — 09

উনিশ শতকের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন

রাজ-উত্তরাধিকার, প্রতিমার উচ্চতা এবং জনসমক্ষে শিল্প প্রদর্শনের বিস্তার

কৃষ্ণচন্দ্রের পাশাপাশি নদিয়ার পরবর্তী রাজাদের, বিশেষত উনিশ শতকের প্রথম ভাগের রাজা গিরীশচন্দ্রের কথাও রাস-ইতিহাসে উঠে আসে। একটি গবেষণায় প্রতিমা দেখা, শিল্পের উৎকর্ষ বিচার করা এবং উপযুক্ত শিল্পীকে পুরস্কৃত করার রাজকীয় ঐতিহ্যের উল্লেখ রয়েছে। নির্দিষ্ট শাসকের ভূমিকা নিয়ে মতভেদ থাকলেও প্রতিমাকে নিজ পূজাস্থল থেকে কেন্দ্রীয় জনসমাগমে নিয়ে যাওয়ার রীতি যে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, তা স্পষ্ট।

স্থানীয় একটি বহুল প্রচলিত কাহিনিতে নবদ্বীপে নদিয়ার রাজকর্মচারী হরগোবিন্দ প্রামাণিকের কথা আছে। রাজা গিরীশচন্দ্রের আমলে তিনি ‘হটহটিকা’ নামের একটি অসাধারণ উচ্চতার বাসন্তী প্রতিমা তৈরি করিয়েছিলেন বলে জনশ্রুতি। কেউ উচ্চতা প্রায় ৩৬ ফুট, কেউ ৩৯ ফুট বলেন; অনুষ্ঠানটি চৈত্র মাসের সঙ্গে যুক্ত বলেও উল্লেখ আছে। এটি প্রত্যেক রাস-প্রতিমার নির্ভুল মাপের প্রমাণ নয়, বরং উচ্চতায় ও কারিগরিতে বিস্ময় সৃষ্টির প্রতিযোগিতার লোকস্মৃতি।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের বর্ণনায় নবদ্বীপে ‘পটপূজা’ দেখার জন্য মানুষের সমাগমের কথা আছে। সেখানে দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি মূর্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। ‘পট’ শব্দটি চলতে থাকলেও সব পূজা যে কেবল সমতল ছবি ঘিরে হত, এমন নয়; পুরনো নাম টিকে থাকতে পারে, যদিও ব্যবহারিক উপকরণ বদলে যায়। একই সময়ে ছোট বহনযোগ্য প্রতিমা এবং বড় শিল্পকর্ম সহাবস্থান করেছে।

এই শতকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সংগঠনও বদলাতে থাকে। রাজদরবারের প্রভাব কখনও বৃদ্ধি পেয়েছে, কখনও কমেছে; কিন্তু স্থানীয় মানুষ, পূজারি গোষ্ঠী ও প্রতিমাশিল্পীদের উদ্যোগেই পর্বটি চালু থেকেছে। রাজপৃষ্ঠপোষকতার একটি উৎসব ক্রমে বৃহত্তর সামাজিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হওয়ার পথে উনিশ শতক ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

> **সারকথা** — আজকের বিশাল মূর্তির আদলকে আঠারো শতকের প্রতিটি পূজার ওপর আরোপ করা ঠিক নয়; প্রতিমার আকার ধাপে ধাপে বেড়েছে।

তথ্যসূত্রের নির্দেশ: [১, ৫]

ঐতিহাসিক অধ্যায় — 10

পারিবারিক পূজা থেকে বারোয়ারি

মহল্লা, সমবেত অর্থসংগ্রহ ও আচার-পরম্পরা যেভাবে উৎসবের প্রধান শক্তি হয়ে উঠল

রাসের বহু পুরনো পূজার সঙ্গে নির্দিষ্ট পরিবার, পুরোহিত বা পেশাজীবী গোষ্ঠীর স্মৃতি যুক্ত। সময়ের সঙ্গে অনেক পূজা বারোয়ারি বা পাড়ার সমবেত উদ্যোগে সংগঠিত হতে থাকে। অর্থসংগ্রহ, প্রতিমা তৈরি, পূজার আয়োজন, বাদ্যযন্ত্র, নিরাপত্তা এবং বিসর্জন-শোভাযাত্রার দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়া সম্ভব হয়। কোনও একটি পরিবারের আর্থিক পরিস্থিতি বদলালেও পাড়ার যৌথ উদ্যোগে পূজার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সহজ হয়।

তেঘরিপাড়ার বড়, মেজ, সেজ ও ছোট শ্যামার কথা এই পাড়া-ভিত্তিক ঐতিহ্যের একটি পরিচিত উদাহরণ। নামগুলির মধ্যে রয়েছে পুরনো ক্রম, সম্পর্ক ও স্থানীয় স্মৃতি। অন্য পাড়ায় ভদ্রকালী, শবশিবা, গঙ্গামাতা, মহিষমর্দিনী, গণেশজননীসহ নানা দেবদেবীর পূজা প্রচলিত। কোথাও কমিটির হাতে দায়িত্ব গেলেও প্রাচীন পুরোহিত পরিবার বা পূজাপদ্ধতির সঙ্গে সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ থাকে।

বারোয়ারি সংগঠন যেমন সহযোগিতা বাড়ায়, তেমন শিল্পের উৎকর্ষ দেখানোর প্রতিযোগিতাও সৃষ্টি করে। প্রতিটি পাড়া নিজের দেবীর বিশেষত্ব রক্ষা করতে চায়। মাটির মূর্তি, সাজসজ্জা, চালচিত্র, অলংকার, আলো, বাদ্যদল এবং ক্রমশ প্রতিমাবাহী যান—সব ক্ষেত্রেই নতুন উদ্যোগ দেখা দেয়। শিল্পী ও কারিগরের দক্ষতা পাড়ার সামাজিক সম্মানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে।

তবে এই উৎসবকে কেবল প্রতিযোগিতা বলা ভুল। রাস উপলক্ষে আত্মীয়স্বজনের আগমন, এক পাড়া থেকে অন্য পাড়ায় দর্শন, স্থানীয় ব্যবসার প্রসার এবং শিশুদের পুরনো পূজার নাম শেখা—এসবও সমান গুরুত্বপূর্ণ। বছরের পর বছর একই দেবীকে কেন্দ্র করে সমবেত হওয়ার ফলে শহরের একটি অলিখিত সামাজিক মানচিত্র তৈরি হয়।

> **সারকথা** — বারোয়ারি ব্যবস্থার বিস্তার রাসকে অল্প কয়েকজন পৃষ্ঠপোষকের উদ্যোগ থেকে বহু পাড়ার স্থায়ী সমবেত উৎসবে রূপ দেয়।

তথ্যসূত্রের নির্দেশ: [১, ৫]

ঐতিহাসিক অধ্যায় — 11

শাক্ত প্রতিমার বৈচিত্র্য

দেবীমূর্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপের মধ্যে পাড়ার ইতিহাস ও শিল্পরীতির প্রকাশ

নবদ্বীপের শাক্ত রসে সব দেবীকে একই কালীমূর্তির আদলে পূজা করার রীতি নেই। দক্ষিণাকালী, শ্যামা, ভদ্রকালী, মহিষমর্দিনী এবং অন্যান্য মাতৃশক্তির রূপ বিভিন্ন পাড়ায় পৃথক পরিচয় পেয়েছে। মূর্তির ভঙ্গি, চোখ, কেশবিন্যাস, বাহন, অস্ত্র, সঙ্গী দেবতা এবং মুখাবয়বের অভিব্যক্তি বিশেষ ধর্মীয় ব্যাখ্যা ও স্থানীয় শিল্পরুচি প্রকাশ করে।

স্থানীয় ঐতিহ্যের আলোচনায় তেঘরিপাড়ার বিভিন্ন শ্যামাপূজা এবং চারিচারা ও হরিসভাপাড়ার ভদ্রকালীর উল্লেখ পাওয়া যায়। শবশিবা ও প্রাচীন মাতৃমূর্তির সঙ্গে যুক্ত অন্য পাড়ার ইতিহাসও গুরুত্বপূর্ণ। কোনও পূজার শতবর্ষ বা নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠাসাল প্রায়ই বংশপরম্পরায় পাওয়া স্মৃতির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে; সেই তথ্যকে দলিলসমর্থিত ইতিহাসের সমতুল্য ধরা উচিত নয়।

একই নামের দেবী হলেও দুটি পাড়ার মূর্তির চেহারা এক হয় না। কোথাও তীক্ষ্ণ উগ্ররূপ, কোথাও শান্ত মাতৃভাব; কোথাও বিস্তৃত পৌরাণিক দৃশ্য, কোথাও প্রাচীন ভাস্কর্যরীতি অনুসরণ করা হয়। শিল্পী ঐতিহ্যকে মান্য করেও সাজ, অলংকার, গঠন ও চালচিত্রে পরিবর্তন আনেন। এই সৃজনশীল স্বাধীনতা থেকেই নানা পাড়ার নিজস্ব ধারার জন্ম হয়েছে।

একজন দর্শকের কাছে রাসের প্রতিমাসমূহ যেন নবদ্বীপের উন্মুক্ত সাংস্কৃতিক আর্কাইভ। এখানে কেবল মূর্তির উচ্চতা বা বাজেট দেখে গুরুত্ব নির্ধারণ করা যায় না। কোনও দেবীর সঙ্গে বহু প্রজন্মের সম্পর্ক, স্থানীয় পূজাপদ্ধতি এবং কারিগরির ধারাবাহিকতা—এসব মিলিয়েই তাঁর ঐতিহাসিক মূল্য।

> **সারকথা** — পুরনো পূজাগুলি কেবল আধুনিক মেলার প্রদর্শনী নয়; প্রতিটি পুজো একটি পাড়া ও তার ধর্মীয় স্মৃতির সাক্ষ্য।

তথ্যসূত্রের নির্দেশ: [১, ৫]

ঐতিহাসিক অধ্যায় — 12

শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণবের সম্মিলন

‘শাক্ত রাস’ নামের আড়ালে নানা ধর্মীয় ধারার প্রতিমা ও আখ্যানের সহাবস্থান

‘শাক্ত রাস’ পরিচিতি থাকলেও এই উৎসবের সব প্রতিমাই কেবল শক্তিসাধনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। গবেষণায় দেবীকেন্দ্রিক, শৈব, বৈষ্ণব, বিভিন্ন দেবতার সম্মিলিত রূপ এবং বাংলা আখ্যানসাহিত্য-নির্ভর প্রতিমার কথা বলা হয়েছে। এই বৈচিত্র্য একটি দীর্ঘ সাংস্কৃতিক বিস্তারের পরিচয়। কার্তিক পূর্ণিমার অভিন্ন তিথির মধ্যে নতুন নতুন ধর্মীয় কাহিনি স্থান পেয়েছে।

কিছু প্রতিমায় ধর্মীয় ধারার মেলবন্ধন স্পষ্ট। কৃষ্ণকালীতে কৃষ্ণ ও কালীর চিহ্ন একসঙ্গে ধরা পড়ে; হরিহর মূর্তিতে বিষ্ণু ও শিব; হরগৌরীতে শিব-পার্বতীর সম্পর্ক ফুটে ওঠে। এইসব প্রতিমা বিভিন্ন দেবশক্তির যোগসূত্রকে দৃশ্যমান করে। তাই নবদ্বীপের রাসকে শাক্ত ও বৈষ্ণবের স্থায়ী বিরোধের একমাত্র গল্পে সীমাবদ্ধ করলে উৎসবের প্রকৃত বৈচিত্র্য আড়াল হয়ে যায়।

পুরাণ ও লোককাব্যের দৃশ্যও প্রতিমায় স্থান পেয়েছে—সতীর দেহত্যাগ এবং শিবের শোক, গণেশের সঙ্গে পিতামাতা, মনসামঙ্গলের বেহুলা-লখিন্দর, রামচন্দ্রের সেতুবন্ধন এবং কৃষ্ণলীলার নানা কাহিনি। মনসা ও গঙ্গামাতার মতো প্রতিমা বাংলার আঞ্চলিক লোকবিশ্বাস ও মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে রাসের যোগকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

আধুনিক জাতীয় চেতনার সময় ভারতমাতার মতো ভাবনাও প্রতিমাশিল্পে প্রবেশ করেছে। এই পরিবর্তন থেকে বোঝা যায় রাস কোনও এক যুগে স্থির হয়ে যাওয়া শিল্পসংগ্রহ নয়। পুরনো আরাধ্যরূপের পাশে নতুন কাহিনি যুক্ত হওয়ার ক্ষমতাই উৎসবটিকে জীবন্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে পরিণত করেছে।

> **সারকথা** — ‘শাক্ত রাস’ প্রাধান্যকারী প্রকাশভঙ্গির নাম; এর প্রতিমা-ঐতিহ্য বাস্তবে অনেক বেশি বহুমাত্রিক।

তথ্যসূত্রের নির্দেশ: [১, ৩, ৫]

ঐতিহাসিক অধ্যায় — 13

মৃৎশিল্প, চালচিত্র ও বৃহৎ প্রতিমা

শিল্পীদের দক্ষতা ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনে রাসের দৃশ্যরূপের বিবর্তন

রাসের প্রতিমা নির্মাণ কেবল মাটি দিয়ে দেবীমূর্তি গড়া নয়; কাঠামো, অনুপাত, অঙ্গভঙ্গি, রং, অলংকার ও ভারসাম্যের সমন্বিত শিল্প। দূর থেকে দেখা যাবে, অথচ বিশাল কাঠামো স্থির থাকবে—এই দুটির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে শিল্পীদের বিশেষ দক্ষতা দরকার। দেবীর মাথা, হাত, অস্ত্র, বাহন এবং পার্শ্বচরিত্র সবই বৃহৎ পরিসরে পরিকল্পিতভাবে নির্মিত হয়।

প্রতিমার পিছনে চালচিত্র বা দেবীপটের ধারাটি ‘পটপূর্ণিমা’র পুরনো ছবিনির্ভর উপাসনার স্মৃতি বহন করে। কোথাও শিব-পার্বতী, কোথাও রাধাকৃষ্ণ, বিষ্ণু, দেবীর অসুরবধ বা অন্যান্য পুরাণকাহিনি স্থান পায়। এর উদ্দেশ্য কেবল ফাঁকা অংশ ভরাট নয়; মূল প্রতিমাকে একটি বৃহত্তর ধর্মীয় ও কাহিনিগত জগতে স্থাপন করা। পটচিত্র থেকে মূর্তিশিল্পে উত্তরণের মাঝেও তাই শিল্পের সুস্পষ্ট ধারাবাহিকতা রয়ে গেছে।

রাজদরবারে প্রতিমার শিল্পকুশলতা বিচার এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন পাড়ার সম্মানরক্ষার প্রতিযোগিতা মৃৎশিল্পীদের সৃজনশীলতাকে উসকে দেয়। কোনও পাড়া নতুন বিন্যাস বা বড় আকার চাইলে শিল্পীরা সেই অনুরোধ পূরণের উপায় বের করেন। অভিজ্ঞ কারিগর থেকে নতুন প্রজন্মে কাজ শেখার মাধ্যমে একটি জীবন্ত দক্ষতার ঐতিহ্য টিকে থাকে।

প্রতিমার আকার যত বেড়েছে, পরিবহণ তত জটিল হয়েছে। মজবুত কাঠামো, চাকা বা বাহন, বাঁক নেওয়ার স্থান, সরু রাস্তা, বিদ্যুতের তার এবং জনসমাগমের বিষয় বিবেচনা করতে হয়। তাই রাসের শিল্প-ইতিহাসে শুধু সৌন্দর্য নয়, স্থানীয় প্রকৌশল ও নগর-পরিকাঠামোর ইতিহাসও জড়িয়ে রয়েছে।

> **সারকথা** — শিল্পীদের নাম, পুরনো নকশা, নির্মাণপ্রণালী ও চালচিত্রের কাহিনি নথিবদ্ধ করা ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য জরুরি।

তথ্যসূত্রের নির্দেশ: [১, ৫]

ঐতিহাসিক অধ্যায় — 14

আড়ং শোভাযাত্রার বিকাশ

রাজসমক্ষে প্রতিমা প্রদর্শন থেকে সুপরিকল্পিত শহরজোড়া পরিক্রমা

নবদ্বীপের রাসের অন্যতম স্বাতন্ত্র্য ‘আড়ং’—প্রধান পূজার পর প্রতিমা নিয়ে জনসমক্ষে বেরোনোর শোভাযাত্রা। প্রাচীন প্রচলিত বর্ণনায় বিভিন্ন পূজাস্থল থেকে প্রতিমা পোড়ামাতলার মতো কেন্দ্রীয় স্থানে আনার কথা আছে, যেখানে রাজপরিবারের প্রতিনিধি শিল্পকুশলতা দেখতেন বা মূল্যায়ন করতেন। পুরস্কারের কথাও কোনও কোনও সূত্রে উঠে আসে। ঠিক কোন বিবরণ কোন রাজার সময়ের, তা সবক্ষেত্রে নিশ্চিত নয়; কিন্তু প্রতিমাকে জনসমক্ষে আনার অভ্যাসটিই ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

মৃন্ময় প্রতিমা বড় ও ভারী হলে কাঁধে বহন করা কঠিন হয়ে পড়ে। তখন কাঠের মঞ্চ, চাকা এবং পরে বিশেষ লোহার গাড়ির ব্যবহার বাড়ে বলে ঐতিহাসিক আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে। কোনও কোনও বাহনে ঘোরানোর ব্যবস্থা থাকে, যাতে পথের দর্শকরা বড় প্রতিমার চারদিক দেখতে পারেন। বিশাল প্রতিমাকে চলন্ত অবস্থায় ঘুরিয়ে দেখানো আড়ংয়ের বিশেষ দৃশ্যনাট্যে পরিণত হয়।

বিশ শতকের দীর্ঘ সময় জুড়ে বিভিন্ন পাড়া থেকে প্রতিমা একই সরু রাস্তায় এসে জটলা করত। ঢাক, সানাই ও অন্যান্য বাদ্যের সঙ্গে উৎসবের স্বতঃস্ফূর্ততা যেমন বেড়েছে, তেমনই দীর্ঘ যানজট এবং জননিরাপত্তার সমস্যা তৈরি হয়েছে। উৎসবের বিপুল জনপ্রিয়তার কারণেই সংগঠক, পৌর প্রশাসন ও পুলিশের সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা দেয়।

১৯৯৪ সালে পরিকল্পিত বৃত্তাকার আড়ং-পথ চালু হওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক পরিবর্তন। আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত এক ব্যক্তির প্রকাশিত স্মৃতিচারণে নবদ্বীপ কেন্দ্রীয় রাস উৎসব কমিটি, পৌরসভা, পুলিশ এবং তৎকালীন অতিরিক্ত জেলাশাসক পি. রমেশ কুমারের ভূমিকার কথা উল্লেখ আছে। এর মাধ্যমে পুরনো প্রতিমাদর্শনের রীতি বজায় রেখেও শোভাযাত্রাকে অধিক সুশৃঙ্খল পথের আওতায় আনার চেষ্টা করা হয়।

> **সারকথা** — আড়ংয়ের ধারাবাহিকতা: কাঁধে প্রতিমাবহন → চাকার মঞ্চ → ঘূর্ণায়মান বাহন → ১৯৯৪ সালে পরিকল্পিত পরিক্রমাপথ।

তথ্যসূত্রের নির্দেশ: [১, ৪, ৫]

ঐতিহাসিক অধ্যায় — 15

জীবন্ত ঐতিহ্য ও ইতিহাসের বিচার

কোন বিষয় অপেক্ষাকৃত প্রতিষ্ঠিত, কোথায় মতভেদ আছে এবং কীভাবে স্মৃতি রক্ষা করা যায়

নবদ্বীপের শাক্ত রাস আসলে দীর্ঘ সময়ে গড়ে ওঠা একটি সম্মিলিত ঐতিহ্য। কার্তিক পূর্ণিমার বৈষ্ণব পটভূমি, অঞ্চলের পূর্বপ্রচলিত শক্তিসাধনা, আঠারো শতকে রাজ-পৃষ্ঠপোষকতা, উনিশ শতকে মৃৎপ্রতিমা ও জনসমক্ষে প্রদর্শনের বিস্তার, এবং আধুনিক পাড়াভিত্তিক সংগঠন ও আড়ং—এই স্তরগুলি মিলিয়েই বর্তমান উৎসব। কোনও একটি স্তরকে সম্পূর্ণ ইতিহাস হিসেবে ধরলে অন্য গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি বাদ পড়ে যাবে।

উৎসবের একটিমাত্র সর্বজনস্বীকৃত প্রতিষ্ঠাসাল নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। প্রাচীন কোনও কালীপূজার সূচনা, রাসে একটি বিশেষ প্রতিমার অন্তর্ভুক্তি, রাজসমর্থন, চক্ররাসের কোনও প্রতিষ্ঠিত অনুষ্ঠান এবং নির্দিষ্ট শোভাযাত্রাপথের সূচনা আলাদা আলাদা ঘটনা। লোকমুখে প্রচলিত স্মৃতি ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান, তবে সমকালীন দলিল না থাকলে সেটিকে স্মৃতিনির্ভর বক্তব্য বলেই চিহ্নিত করা উচিত।

এই উৎসবের ঐতিহ্য শুধু বিরাট প্রতিমা নয়। পূজার পুরনো নিয়ম, পাড়ার নাম, শিল্পীর দক্ষতা, চালচিত্র, ঢাক-সানাই, পথপরিক্রমা, মেলা, ব্যবসা এবং পুরনো প্রজন্মের অভিজ্ঞতা—সবই এর অমূল্য অংশ। পুরনো পূজা কমিটির নথি সংগ্রহ, প্রবীণ ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার, প্রতিমার ভঙ্গি ও নির্মাণপদ্ধতির ছবি এবং পুরনো সংবাদপত্রের উল্লেখ সংরক্ষণ করা জরুরি।

সবশেষে রাস নবদ্বীপের সাংস্কৃতিক সহাবস্থানের একটি ঐতিহাসিক দলিল। কৃষ্ণের লীলাস্মৃতি-সংযুক্ত একটি তিথি শক্তির বিচিত্র রূপের জন্যও স্থান তৈরি করেছে। ধর্মীয় আচার, পাড়া-সমাজ ও শিল্পীদের উদ্ভাবন একে অনন্য করে তুলেছে। এই উৎসবের প্রকৃত ধারাবাহিকতা একটি অপরিবর্তিত মূর্তিতে নয়, বরং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ঐতিহ্যকে জীবন্ত রাখার ক্ষমতায়।

> **সারকথা** — ইতিহাস লেখার সময় দলিলসমর্থিত ঘটনা, লোকস্মৃতি ও পরবর্তী ব্যাখ্যাকে আলাদা করে চিহ্নিত করাই সবচেয়ে জরুরি।

তথ্যসূত্রের নির্দেশ: [১–৬]

নির্বাচিত প্রকাশিত তথ্যসূত্র

[১] সঙ্গীতা সেন, “History of the Ras Festival of Nabadwip”, Pratidhwani the Echo, অক্টোবর ২০২২, পৃ. ১১৪–১২০।

[২] দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, “আজও অটুট রাসের মেজাজ”, আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪ নভেম্বর ২০১৭; শান্তিরঞ্জন দেবের বক্তব্যসহ।

[৩] দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, পটচিত্র নিয়ে প্রতিবেদন, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২ নভেম্বর ২০১৭।

[৪] “নবদ্বীপ” (চিঠিপত্র), আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৭ নভেম্বর ২০১৫; ১৯৯৪ সালের আড়ং-পথ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ বিবরণ।

[৫] অংশুমান ভৌমিক, “রাসের খাস খবর”, ডাকবাংলা।

[৬] নবদ্বীপের প্রাচীন কালী ও রাসমেলা নিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন।

দ্রষ্টব্য: এটি প্রকাশিত গবেষণা, সংবাদপত্র ও ঐতিহাসিক বিবরণের ভিত্তিতে তৈরি বাংলা ইতিহাস-সংকলন; উল্লেখিত বইটির সম্পূর্ণ পাঠ যাচাই করা সম্ভব হয়নি।